“বাংলাদেশের শিক্ষানীতির বিবেচনা”

অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, সভাপতি, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩ নভেম্বর, ২০০৯)

সহযোগিতায়: বিধান চন্দ্র পাল ও সানজিদা হক বিপাশা

শিক্ষা প্রায় সকল সরকারকেই নানাভাবে কর্মে ব্যাপৃত রেখেছে। ১৯৪৮-এ পাকিস্তান আমলে করাচিতে যে শিক্ষা সম্মেলন হয়েছিল সেখানেও শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে নানা চিন্তা-ভাবনা উঠে এসেছিল। তবে লক্ষ্যণীয় যেটা, সেটা হলো মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলা হলেও উর্দুকে প্রাধান্য দেয়ার একটা প্রচেষ্টা ছিল। আর বাংলাকে নিয়ে নানা রকমের নিরীক্ষার গোপন প্রয়াস আমরা পরবর্তীতে লক্ষ্য করেছি। এ সবই ছিল জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে ভাষা ও ধর্মকে কাজে লাগাবার এক অস্বচ্ছ ধারণার ফল। ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন আমাদের অনেকেরই স্মৃতিতে আছে। এ সমস্ত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ভালো-মন্দ মিশিয়েই ছিল, কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এগুলোর গ্রহণযোগ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে রেখেছিল। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও সর্বজনীন করার চিন্তা বহুকালের। বৃটিশ বাংলা, পাকিস্তান পেরিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের এ বিষয়টি সংবিধান প্রথম পঞ্চমবর্ষিক পরিকল্পনা এবং কুদরাত-এ-খুদার রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি সরকারি আদেশে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারিকরণ এ চিন্তা থেকেই উৎসারিত হয়েছে। যেহেতু সময় বসে থাকে না এবং রাজনীতি অর্থনীতিতে নানা পরিবর্তন আসে সে কারণে শিক্ষা সম্পর্কিয় কতগুলো মৌলনীতি সম্পর্কে মতভিন্নতা না থাকলেও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ ও দাতাদের নানা রকম অর্থায়নের প্রচেষ্টায় শিক্ষা খাতে বিক্ষিপ্ত পরিবর্তন ঘটেছে। এ কারণেই আমরা নানা মাধ্যমের বিভিন্ন মানের প্রাথমিক শিক্ষালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একটি অসমন্বিত ও অনিয়ন্ত্রিত সমাজ ও জীবনবিচ্ছিন্ন বাজারমুখি ও দাতা সাহায্যপুষ্ট এমন এক অবস্থায় নিপতিত হয়েছি যে, শিক্ষা নিয়ে সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নানাভাবে অনুভূত হয়েছে। এ কারণেই কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের পরে সকল সরকারি শিক্ষা নিয়ে কমিটি বা কমিশন গঠন করেছেন, এর রিপোর্টগুলো সংসদে বা জনগণের মধ্যে তেমন আলোচিত হয় নি। এগুলোর সুপারিশও সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল একথা বলা যায় না। এ প্রেক্ষিতেই বর্তমানের জাতীয় শিক্ষা কমিটির রিপোর্টটিকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষাখাতে সমন্বয় ও সুব্যবস্থাপনার একটি জরুরি তাগিদ সবাই অনুভব করছেন বলেই মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি স্মরণ করা যায়। ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে। ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে ...জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে মেহনতী মানুষের অংশগ্রহণ এবং তাদের সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে। ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা, কর্মের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ উৎপাদনশক্তির ক্রমবিকাশ এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতিসাধন রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে একই পদ্ধতির গণমুখি ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। সময়ের প্রয়োজনে সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৯৭৪ থেকে ২০০৯ সাল নাগাদ যে ক'টি কমিটি/কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে সবকটিতেই নেতৃত্ব ও সৃজনশীল ক্ষমতাধারী সুনাগরিক তৈরিতে নৈতিক-মানবিক মূল্যবোধ, প্রয়োগমুখি শিক্ষা, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন, বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি ও ঐতিহ্য সচেতনতাসমৃদ্ধ জনসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষার বিশেষ ভূমিকাকে শিকার করে নেয়া হয়েছে। লক্ষ্যণীয় রিপোর্টের উপস্থাপনায় এই লক্ষ্যাবলীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও মৌলিকভাবে এ লক্ষ্যগুলির সার্বিক একটি ঐক্যতান লক্ষ্য করা যায়।

রিপোর্টগুলোতে নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। যেগুলো পূর্ণভাবে আজকে আলোচনা সম্ভব নাও হতে পারে। সে কারণে কয়েকটি দিকে আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা: প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সকল রিপোর্টেই আলোচিত হয়েছে। কুদরাত-এ খুদা কমিশনে শিশু ভবন ও শিশু উদ্যানের প্রস্তাবনা আছে। মফিজউদ্দিন আহমদের রিপোর্টে ব্যাপক অনুসন্ধান, পরিকল্পনা প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে এবং এখানে সমাজকল্যাণ ও পরিবারকল্যাণ কর্তৃপক্ষের ভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শামসুল হক সাহেবের রিপোর্টে ছয় মাসের একটি প্রস্তুতিমূলক শিক্ষাকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মনিরুজ্জামান মিঞার রিপোর্টে আনন্দদায়ক পরিবেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সামাজিকীকরণ, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন, সংবেদনশীলতা অর্জন ও সার্বিক যোগ্যতার দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি পৃথক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রস্তাবনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত কবীর চৌধুরী কমিটির রিপোর্টে পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় জ্ঞান, অক্ষর জ্ঞান, নৈতিকতা শিক্ষার জন্য প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রযুক্ত মনে করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে লক্ষ্যণীয় যে, কোনো কোনো রিপোর্টে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট নির্দিষ্ট স্তর হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে প্রশিক্ষিত শিক্ষক, শিক্ষালয়, শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে পরিচালনার ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। অন্যকিছু রিপোর্টে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতিপর্ব হিসেবেই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে গণ্য করা হয়েছে। এ দু'টি চিন্তা পরস্পর বিপরীতমুখি না হলেও দ্বিতীয়টি অনেক সীমাবদ্ধ। আমাদের ধারণা বিজ্ঞানের চিন্তায় যখন দু' থেকে তিন বছরের মধ্যে শিশুর মস্তিস্ক গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন গৃহের স্নেহশীল নিরাপদ আশ্রয় থেকে একটি অপরিচিত প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে স্থানান্তরের জন্য বিশেষ আনন্দঘন ব্যবস্থার প্রয়োজন। এজন্য আমাদের ধারণা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বর্তমান রিপোর্টটি অসম্পূর্ণ এবং এজন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। তবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশংসনীয় বলা যায়। একটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে তা হলো তিন ধারার বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বিভিন্নতা ও মানসিক বিভাজন আছে প্রাক প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানে এটির উত্তরণ

ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, নাহলে বিভাজিত সমাজের প্রতিফলন হয়েই শিক্ষাশুরু হবে এবং সুযোগের নানা প্রান্তিকতায় এটি প্রাতিষ্ঠানিকতায় পরিণত হতে বাধ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ যেমন ঘটেছে তেমনি বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন মানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে একটি চ্যালেঞ্জ হলো এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন। আমাদের তিন ধারার শিক্ষায় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ভিন্ন হয়ে উঠেছে, তেমনি নাতি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠক্রমের ভিন্নতাও লক্ষ্যণীয়। বিবেচ্য রিপোর্টে ধারণা করা হয়েছে যে, কয়েকটি মূল বিষয়ে পাঠক্রম নির্দিষ্ট করে দিয়ে বিভিন্ন ধারার শিক্ষালয়গুলোকে সংযোজনের জন্য স্বাধীনতা দিলে এ বিষয়ের একটা সমাধান পাওয়া সম্ভব। ইতোমধ্যে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষালয় ও তাদের সমর্থকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ওজোর আপত্তি উঠছে। ইংরেজী মাধ্যমেও নিরবে একটি আপত্তি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ধারণা হয়, সরকারের নূন্যতম অভিন্ন শিক্ষাক্রম বিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হবে। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুদাননির্ভর নয় এবং অভিভাবকদের মধ্যে যেখানে ভিন্নতর "উচ্চমানের শিক্ষার" একটা চাহিদা পরিলক্ষিত হয় সেখানে বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন এবং অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠসূচি বাস্তবায়ন দুঃসাধ্য। ধরা যাক, মাদ্রাসায় এই অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠসূচি প্রবর্তিত হলো এবং সে সাথে যুক্ত হলো মাদ্রাসার আরবি শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষার বিষয়টি। বর্তমানে মাদ্রাসায় তাদের শিক্ষাক্রম যতটা গুরুত্ব পায় সরকারের দেয়া বাংলা, ইংরেজী, গণিত অথবা বিজ্ঞান ও পরিবেশ পরিচিতি ততটা গুরুত্ব পায় না। এখন যদি সরকারের দেয়া পাঠক্রমকে গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে হয় পাঠদানের সময়কে বিস্তৃত করতে হবে অথবা ক্লাসের সময়টিকে আরো সংক্ষিপ্ত করতে হবে। প্রথমটিতে শিশুর সহশিক্ষা কার্যক্রমের ওপরে সীমাবদ্ধতা আসবে, দ্বিতীয়টিতে শিক্ষার মান ধরে রাখার সমস্যা দেখা দেবে। ইংরেজী মাধ্যমে যারা বর্তমান সরকার নির্দিষ্ট পাঠক্রম মেনে চলেন না তারা 'ও' 'এ' লেভেল ছাড়াও ভারতের জি.সি, আমেরিকান স্কুলের পাঠক্রম, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পাঠক্রম ছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল বেকেলোরিয়াসহ নানা ধরনের শিক্ষাক্রমের সাথে যুক্ত। আমাদের পাঠক্রমের সাথে সমন্বয়ন দুরূহ হবে বলে ধারণা। এটা থেকে উত্তরণ পেতে হলে দুতাবাস আশ্রিত বিদ্যালয়ের বাইরে যারা শিক্ষাক্রম পরিচালনা করছেন তাদের সহায়তায় আমাদের জাতীয় জি.সি পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। এমন প্রচেষ্টাও মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে নেয়া সম্ভব কি-না সেটা বিবেচনা করা দরকার। অর্থাৎ একটা বিভিন্নতা সামাজিক কারণে মেনে নিয়ে ক্রমান্বয়ে এই তিন ধারাকে সন্নিকটবর্তী করে তোলার প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন হবে। এজন্য একটি উচ্চমানের নিরীক্ষাধর্মী ও গবেষণাভিত্তিক ইন্সটিউট অব এডুকেশনের প্রয়োজন আছে। যেকথা মওলানা আজাদ দিল্লীর ইন্সটিটিউট অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠার সময় উচ্চারণ করেছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় অন্য একটি বিষয় হলো শিক্ষায় স্তরবিন্যাস। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে যুক্ত হচ্ছে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, তারপরে পঞ্চম শ্রেণীর সাথে যুক্ত হচ্ছে আরো তিনটি শ্রেণী। স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা একটি ভিন্নতর পরিচালনার দাবি রাখে। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হলে এটার দু'টি স্তর মেনে নিতে হয়। স্তর বিভাজন কী পাঁচ যোগ তিন হবে না চার যোগ চার হবে এটাও একটা বিবেচনার বিষয়। বিবেচনার মূলে থাকছে ছাত্রের ক্রম অগ্রসরমানতার সম্ভাবনা, শিক্ষকের বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠদানের সক্ষমতা, পাঠ উপকরণের শ্রেণীভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, বয়সভিত্তিক সহশিক্ষার প্রচলন এবং এর সাথে যুক্ত থাকছে মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রচলন। এই শিক্ষানীতিতে কায়িক শ্রম, সৃজনশীলতা, ভিন্ন জাতিসত্ত্বার জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ধরে রাখা, শিক্ষক নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার পরিবেশ, আকর্ষণীয় পাঠক্রম, যথাযথ মানের পাঠপুস্তক, সৃজনশীল শিক্ষাদান, খেলাধূলা ও সহশিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। সহজেই অনুমেয় যে, বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি খাতের বিদ্যালয়গুলোতে এগুলোর কম-বেশি ঘাটতি আছে। এই ঘাটতি থেকে উত্তরণ এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি ব্যয়, শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। এজন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনাসহ সহায়ক ভূমিকার জন্য মেধা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপদেশন পরিষদ প্রয়োজন হবে। যারা নানান রকমের মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জনের মাপকাঠি এবং অনার্জনের কারণসমূহ দ্রুত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করতে পারবে। এই জাতীয় শিক্ষানুরাগী সমন্বয় করতে না পারলে কেবলমাত্র প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক পরিবর্তনে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ হবে না। শিক্ষানীতি সম্পর্কিয় কমিটিতে অনেক সুচিন্তার সংকলন ঘটলেও এটি বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে বিবেচনা অতি সীমিত।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তৃতীয় যে বিষয়টি উচ্চারিত হতে শোনা যায় সেটি হলো ইংরেজী শিক্ষার অবস্থান। বর্তমান কমিটি আগের কমিটিগুলোর মতোই মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে মেনে নিয়েও ইংরেজী শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য করেছে। ইংরেজী এবং বাংলা মাধ্যম স্কুলে এটি সমস্যার সৃষ্টি না করলেও মাদ্রাসায় আরবি শিক্ষার উপস্থিতি একটি ভিন্ন মাত্রার সমস্যা চিহ্নিত করে। একটি শিশুকে তিনটি অথবা চারটি ভাষার মুখোমুখি করে দেয়া হয়। যাদের বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ সীমিত এবং যে সমস্ত শিক্ষালয়ে শিশুর মনস্তত্ত্বে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের স্বল্পতা থাকে সেখানে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় মানসিক অভিযোজনের সীমাবদ্ধতা উত্তরণের সহায়ক শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি সৃজনশীল পন্থায় পাঠানুক্রম নির্দিষ্ট না হলে তার সংশ্লেষ শিশুর মনে স্থায়ী হয় না, ফলে দক্ষতার ক্ষেত্রে যে বিভাজনের সৃষ্টি হয় সেটি পরবর্তীতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং অগ্রসরমানতায় একটি নিয়ামক হিসেবে দেখা হয়। ছাত্র এবং সামাজিক পরিবেশভিত্তিক এ জাতীয় প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের জন্য কোনোরকম সুপারিশ এই রিপোর্টে লক্ষ্য করা যায় না।

চতুর্থত প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকেরাই ভবিষ্যত শিক্ষার একটি ভিত রচনা করেন, ছাত্রের মধ্যে বিভিন্ন রকমের দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে। এ কারণে প্রাথমিক স্তরে মেধা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিচারে শিক্ষক নির্বাচন আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। বর্তমানে যেভাবে শিক্ষক নির্বাচন হয় এবং শিক্ষার যে স্তর নির্দিষ্ট আছে নির্বাচনের জন্য উপরন্তু বেতন-কাঠামোর অনাকর্ষণীয় অবস্থান ছাড়াও সরকারি চাকুরির স্তরক্রমে শিক্ষকদের যে অবস্থান নির্দিষ্ট হয় সেটি প্রাথমিক স্তরে সৃজনশীল শিক্ষার জন্য যথাযথ কি-না তা বিবেচনার দাবি রাখে। রিপোর্টে বেতন ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বেশকিছু সুপারিশ আছে। এই সুপারিশগুলো মেধাসম্পন্ন সৃজনশীল, দায়িত্ববান শিক্ষককে শিশুর অঙ্গনে নিয়ে আসতে

পারবে কি-না সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমাদের অতীতে অভিজ্ঞতা অনেকক্ষেত্রেই খুব সুখকর নয়। ফলে ঝড়ে পড়ার প্রবণতা বেড়েছে, শিশু নির্যাতনের ঘটনাও জানা যায় এবং শিশুর মন ও মননকে শিক্ষামুখি করে তোলার ব্যর্থতাও কিন্তু কম নয়। প্রাথমিক স্কুলে অংক, ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষকের অপ্রতুলতা চোখে পড়ার মত। বাংলা শিক্ষকের দক্ষতা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষকদের এই জাতীয় সীমাবদ্ধতাতে উত্তরণ করার একটি সক্রিয় প্রয়াসের প্রয়োজন এবং সেখানে রাজনৈতিক সংশ্লেষ যদি থাকে তাহলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষালয়ে অভিভাবকদের মাধ্যমে সমাজের একটি সুস্পর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষায় অনুপ্রাণিত অভিভাবক তার সন্তানের সুশিক্ষাকে নিশ্চিত করতে শিক্ষকের সহযোগী হতে পারে। আমাদের শিক্ষালয়ে অভিভাবক সাধারণত একজন কৃপাপ্রার্থী। ফলে গৃহ, সমাজ ও শিক্ষালয়ের একটি সুসমন্বিত অবস্থান সৃষ্টি হয় না। তার মধ্যে বাধা হয়ে আসে আমলাতান্ত্রিকতা, নানা রকমের আমলাতান্ত্রিক আদেশ-নির্দেশ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটাবার প্রচেষ্টা এবং শিক্ষা বহির্ভুত নানা কার্যক্রমে ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতির নির্দেশনা। স্কুল পরিচালনায় যদি শিক্ষাক্রমের প্রাধান্যকে শিকার করে না নেয়া হয় এবং ছাত্র-শিক্ষক শিক্ষাঘণ্টা যথাযথভাবে গভীরতা ও ব্যাপ্তি সহকারে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে শিক্ষা কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই রিপোর্টে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক বাধাসমূহ বিদূরণের তেমন কোনো আলোচনা অথবা সুপারিশ চোখে পড়ে না।

প্রাথমিক শিক্ষাকে জীবনমুখি, কর্মমুখি করে তোলার বিষয়টি নানা সময়ে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে এটি কীভাবে সংযোজিত হবে সেটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন কারিগরি ও কৃষি কাজের হাতে-কলমে পরিচিতি আবশ্যকীয় মনে হয়। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পরে যাদের কর্মজীবন শুরুর অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে তারা মানসিকভাবে এবং কিঞ্চিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ জাতীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারে। কারিগরি শিক্ষাকে মূল ধারার শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখার যৌক্তিকতা নাই। আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজ ও সম্প্রসারণশীল নগরায়ন বিভিন্ন রকমের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই কর্মজগৎ-এর সাথে প্রাথমিক শিক্ষার শেষ বর্ষগুলোতে একটি পরিচিতি থাকা উৎপাদনশীল সমাজ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এ কার্যসম্পাদন করতে স্কুলে যে জাতীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন সেই বিনিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে।

সবশেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে মধ্যাহ্ন আহারের বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে সেখানে এর উপযোগ যতটা চিহ্নিত হয়েছে এর সমস্যা ততটা আলোচিত হয়নি। একসময়ে মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা কোনো কোনো বিদ্যালয়ে করা হলে অব্যবস্থাপনার কারণে এটি বন্ধ করে দিতে হয়। বিদেশে যেখানে এ ব্যবস্থা প্রচলিত সেখানে স্কুলেই রান্না করার ব্যবস্থা থাকে এবং অভিভাবক ও শিক্ষকেরা মিলে এটি পরিচালনা করেন। অভিভাবক শিক্ষক পর্ষদ এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করে থাকেন। আমরা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের ব্যাপারে দুর্নীতির উপস্থিতি দেখেছি, মহিলা উপবৃত্তির খাতেও অনিয়ম কম দেখা যায় নি। এ দু'টি কার্যক্রমের ফলে শিক্ষালয়ে শিশুর উপস্থিতি বাড়লেও সার্বিক অর্জন কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। মধ্যাহ্নের আহার নিশ্চিতভাবে গ্রামীণ ও দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে এবং শহরের বস্তিতে শিশুদের উপস্থিতি বাড়াবে। কিন্তু অন্যবিধ ব্যবস্থাগুলো সঠিক না হলে এটা থেকে অর্জন শেষ পর্যন্ত ঘাটতিতে পরিণত হতে পারে। এজন্য স্কুল ব্যবস্থাপনাকে ভিন্নভাবে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন আছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় কম্পিউটার শিক্ষা প্রয়োজনীয় বলে অনেকে অনুমান করেন এবং উন্নত দেশে এটি প্রায় সর্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমাদের প্রাথমিক স্কুলেও কম্পিউটার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কিন্তু কম্পিউটার শিক্ষাদানের যোগ্য শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, যেটি ঘন ঘন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না, ব্যবস্থা করা সম্ভব কি-না সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। একসময়ে থানাভিত্তিক এডুকেশন রিসোর্স সেন্টারের প্রস্তাবনা ছিল যেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় নি। প্রাথমিকভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে কেন্দ্রিয় পাঠাগার, বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ এবং বিভিন্ন জ্ঞানের শিশুতোষ বইয়ের সংগ্রহ থাকা প্রয়োজন। এগুলো ব্যবহারের জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ইউনিয়নের সকল স্কুলকে সুযোগ দেয়া যেতে পারে। যে সমস্ত স্কুল সামাজিক অনুদানে এ জাতীয় শিক্ষা উপকরণ তাদের শিক্ষালয়ে স্থিত করতে পারেন তারা সে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

দুর্গম অঞ্চলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরে পুষ্টির কথা বিবেচনা করে দুপুরের মধ্যাহ্নের আহারের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকাদান ও পরিচ্ছন্নতা এবং গৃহ ও শিক্ষালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন। এজন্য সরকারের স্কুল স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতি ইউনিয়নে একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সরকারিভাবে স্থাপন করা হয়েছে, এর সাহায্যেই এটা করা সম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রমে শরীরচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চা অন্যান্য শিক্ষাক্রমের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টির দিকে রিপোর্ট প্রণেতারা যথার্থ মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রাথমিক পর্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা থাকবে না বলা হয়েছে। আমরা অতীতে অটোপ্রমোশনের কুফল সম্পর্কে জানি। ধারণা করা হচ্ছে অনুষ্ঠানিক না হলেও অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন পদ্ধতি এ পর্যায়ে থাকবে যদিও এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হতে পরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে বছরে দু'টি আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হবে। ধারণা করি এর ফলে শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতির অংশ হিসেবে মাসিক বা দ্বিমাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে না। পঞ্চম শ্রেণীতে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার পরে একটি সমাপনী পরীক্ষা আঞ্চলিকভাবে পরিচালিত হবে এবং সে পরীক্ষাই পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হবার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদের ধারণা পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা বাদ না দিলেও বৃত্তিদান ও সক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য ভিন্নতর পরীক্ষা নেয়া সম্ভব। দু'টি পরীক্ষার লক্ষ্য

কিন্তু ভিন্ন। শিক্ষা কমিটি দুই পরীক্ষার চাপ চাপিয়ে না দিতে আঞ্চলিক পরীক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমেই আঞ্চলিক পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে পারে এবং এর পরেই এ পরীক্ষায় গণিত, বাংলা ভাষা, ইংরেজী ভাষা, বিজ্ঞান ও পরিবেশ পরিচিতি এমসিকিউ পদ্ধতিতে আঞ্চলিক পরীক্ষার আয়োজন করা সম্ভব। ইংরেজী ও বাংলাতে রচনাধর্মী একটি প্রশ্ন থাকা অসঙ্গত নয়। বর্তমানে কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আঞ্চলিক পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। স্মরণ করা যেতে পারে শরিফ কমিশন ১৯৬২ সালেই পঞ্চাশ হাজার ছাত্রের জন্য একটি পৃথক বোর্ডের কথা ভেবেছিলেন। আমাদের ধারণা উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হলে ভালো হয়। বর্তমানে পরিদর্শনের কাজ যে শিক্ষা অফিসারদের ওপর ন্যাস্ত আছে তারা এই বোর্ডের সাথে যুক্ত হবেন এবং এর সভাপতি হিসেবে স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। আমাদের যত্নবান হতে হবে যে, এই পদটি রাজনীতিকরণের মাধ্যমে যেন অপাত্রে নিয়োগ দেয়া না হয়। এখানে অন্য আরেকটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন সেটি হলো, প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো বর্তমানের মত পাঁচ যোগ তিন হবে না চার যোগ চার হবে। কারণ সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরীক্ষাটি চতুর্থ বর্ষের শেষে পঞ্চম বর্ষে ফেলতেই নেয়া প্রয়োজন হবে। বর্তমানে প্রস্তাবিত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে আঞ্চলিক পরীক্ষার ভিত্তিতে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা থাকবে। আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় এ পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক এবং বৃত্তির টাকা বণ্টনে নানা অনিয়মের কথা শোনা যায়। মেধাবৃত্তিক বৃত্তি ক'জনকে কীভাবে দেয়া হবে সে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। এটা আঞ্চলিক মেধা তালিকা (নম্বর বা গ্রেড ভিত্তিক) হলে আঞ্চলিক পর্যায়ে সর্বাধিক কতগুলো বৃত্তি দেয়া সম্ভব সে বিষয়টি বিবেচিত হয়ে বৃত্তির জন্য অঞ্চল ভিত্তিতে সমাজের সহযোগিতায় একটি এডুকেশন এনডাওমেন্ট ফান্ড গড়ে তোলা সম্ভব কি-না, সেটাও বিবেচনা করা দরকার। যাতে সরকারের বাজেটের ওপর ক্রমবৃদ্ধিমান চাপ শুরু থেকেই সীমিত করার একটি ব্যবস্থা কার্যকর করা যায়। এই কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রম ভিন্নতর হবে এবং এখানেও প্রতিবর্ষে দু'টি পরীক্ষা থাকবে। অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষাটি হবে "পাবলিক পরীক্ষা" অর্থাৎ এটি আঞ্চলিক পরীক্ষার চাইতে ভিন্ন। মনে হয় বর্তমানের এসএসসি পরীক্ষার মত। ধারণা করা হয় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে একটি সমাপনী স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর পরে কেউ কারিগরি শিক্ষায় এবং অন্যরা মূল ধারার শিক্ষায় পড়বেন। স্মরণ করা যেতে পারে ইংরেজী মাধ্যমের পরীক্ষা দ্বাদশ শ্রেণীর পরে হয়, অষ্টম শ্রেণীতে কোনো "পাবলিক পরীক্ষা" নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান শিক্ষাক্রম এ সিদ্ধান্তের ফলে পরিবর্তিত হবে বলে মনে হয়। অর্থাৎ এফতেদায়ী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। স্মরণযোগ্য যে, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীতে সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার আবশ্যিক বিষয়াবলী এক হলেও অতিরিক্ত বিষয় মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার চাইতে চারগুণ। ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণীতে এই অতিরিক্ত বিষয় সাধারণ শিক্ষার চাইতে মাদ্রাসা শিক্ষার চাইতে তিনগুণ বেশি। এগুলো শিক্ষাক্রম, শিক্ষাঘণ্টা এবং মূল্যায়ন পরীক্ষার জন্য যে জটিলতার সৃষ্টি করবে তার সমাধান বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক আলোচনায় ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব পায় নি। সাধারণ শিক্ষায় তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা আবশ্যিক হিসেবে দেখানো হয়েছে। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ছাড়াও কোরআন ও তাজবিদ এবং আকাইদ শিক্ষা ও ফিকহ্ আরবি শিক্ষার সাথে প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। এদিক থেকে নৈতিক শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষাকে অবহেলা করা হয়েছে একথা বলার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। স্মরণীয় যে, নৈতিক ও ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় ন্যাস্ত করা সঙ্গত নয়। একসময়ে যখন মূলধারায় ধর্মীয় শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না, তখন এ দেশের শিক্ষার্থীরা বাড়িতেই ধর্ম শিক্ষা পেয়েছেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক আবহে নৈতিকতাকে নিজ নিজ জীবনযাত্রায় উন্নীত করেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা: মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি ধারা – সাধারণ, ভোকেশনাল ও মাদ্রাসা – রাখা হয়েছে। এই তিনটি ধারাতেই বাংলা, ইংরেজী এবং গণিতকে আবশ্যিক পাঠ্য বলে চিহ্নিত করা আছে। সাধারণ ও ভোকেশনাল শিক্ষায় অন্য দু'টি আবশ্যিক বিষয় হলো – বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং তথ্যপ্রযুক্তি। কিন্তু মাদ্রাসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তিনটি আবশ্যিক বিষয় আছে – আরবি, আল কোরআন, হাদিস ও ফিকাহ্। নবম, দশম শ্রেণীতে সাধারণ শিক্ষায় তিনটি উপধারা তথা বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসা শিক্ষা চিহ্নিত হয়েছে। মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ্য করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীর জন্য বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর মধ্যে সামাজিক বিজ্ঞান অন্য সবার মত অন্তর্লীন করা হয়েছে। আমাদের ধারণা বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীর জন্য সমাজবিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞানের মতই আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। ঐচ্ছিক বিষয়ে যে দীর্ঘ তালিকা দেয়া হয়েছে এটি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সে কারণে এত বিষয়ের অবতারণা পরীক্ষা গ্রহণে অকারণ অসুবিধা সৃষ্টি করবে এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার দক্ষতার শিক্ষকের স্বল্পতা থেকেই যাবে। মনে হয় এটি একটি সমঝোতার প্রয়াসমাত্র, বাস্তবতায় যেটি সম্ভব করা যাবে না। অন্য যেটি বিবেচ্য সেটি হলো স্কুল শিক্ষা দর্শনের বিতর্ক কোমলমতি ছাত্রদের অষ্টম শ্রেণীর পরেই সাধারণ শিক্ষায় এত বেশি বিশেষায়ন প্রয়োজন কি-না? এক্ষেত্রে 'ও' 'এ' লেভেলের দিকে তাকালে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়ে সীমিত তালিকা পাওয়া যাবে এবং আমাদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ঐচ্ছিক বিষয় বর্তমানে পাঠদান করা হয়, তার ভিত্তিতে বিষয়গুলোর আরো সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব বলে আমাদের ধারণা। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষাক্রমে জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতের যে কোনো একটিকে নির্বাচন করার বিষয়ে বলা হয়েছে। এক সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এরকমটি ব্যবস্থা করা হতো। বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চতর গণিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি এবং যেহেতু জীববিজ্ঞান ঐচ্ছিক বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত আছে সে কারণে উচ্চতর গণিতকেই বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যিক করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য গণিত শিক্ষার ভালো শিক্ষকের অপ্রতুল্যতা স্মরণ করে উত্তরণের বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। মানবিক শিক্ষায় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতির পরিবর্তে আল হাদিস, ফিকহ্ ও ওসুল ফিকহ্ পড়বে। কিন্তু তাদের ঐচ্ছিক বিষয়ে ইতিহাসের পরিবর্তে ইসলামের ইতিহাস রাখা হয়েছে। ভূগোলের কোনো স্থান নেই, অর্থনীতির ও পৌরনীতির অবস্থাও তাই। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসকে কীভাবে শিক্ষাক্রমে সমন্বিত করা যায় সেটা বিবেচনা করা দরকার। ব্যবসা শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈর্ব্যাচনিক বিষয়ে ব্যবস্থাপনা বিষয়টি সম্ভবত ব্যবসায় নীতির ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এটা এমন প্রচ্ছন্নভাবে আছে যে, এ সম্পর্কে যথাযথভাবে ধারণা পাওয়া মুশকিল। ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে নির্বাচনী বিষয়ে যে বৃত্তিমূলক ট্রেডে এত বেশি

উপশাখা ও বিষয় রাখা হয়েছে যে, কোনো একটি উপশাখায় ন্যূনতম জ্ঞানার্জন এবং সেগুলোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের সমন্বয় করা অসুবিধাজনক হবে বলে মনে হয়। আমাদের ধারণা যে, এ বিষয়ে ট্রেনিং এবং এডুকেশন এ দুটোকে মনে রেখে দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ আছে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম মূলত বাংলা হলেও ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান রিপোর্টে শিকার করে নেয়া হয়েছে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দশম শ্রেণীর পরে পঞ্চম শ্রেণীর মত আঞ্চলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। রিপোর্ট থেকে ধারণা করা যায়, নবম ও দশম শ্রেণীতে একটি ক্লাস সমাপনী পরীক্ষা হবে। বর্তমানে এ দু'টি পরীক্ষা সম্পর্কে স্কুল সাধারণত যত্নবান। আঞ্চলিক পরীক্ষা যদি বর্তমানের শিক্ষাবোর্ডের মত হয় তাহলে ব্যবস্থাপনাটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। শিক্ষায় অংশগ্রহণ যেহেতু বাড়ছে সে কারণে প্রতিটি জেলায় একটি মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য আঞ্চলিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন ও কার্যকর করা প্রয়োজন। এই বোর্ডের কাছেই পরিদর্শনের ক্ষমতা দিতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে এখন উচ্চ মাধ্যমিক সমন্বিত হবে। ধারণাগতভাবে এটি সহজ মনে হলেও যেহেতু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মান ও শিক্ষণ পদ্ধতি বর্তমানে ভিন্ন সে কারণে একই শিক্ষালয়ে এ দু'টি স্তরের একীভূতকরণ প্রাথমিক শিক্ষায় তিনটি নতুন শ্রেণীর সংযোজনের মতই সমস্যার সম্মুখিন হতে পারে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার তিনটি ধারা বর্তমানের মতই রাখা হয়েছে এবং বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষায় আবশ্যিক ও নৈর্ব্যাচনিক বিষয় নিয়ে মতভেদ থাকার সম্ভাবনা কম। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষাক্রমের ঐচ্ছিক ধারায় ক্রীড়া, ভাষা এবং আইনের অন্তর্ভুক্তি কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটি বোঝা মুশকিল। মানবিক খাতে যে ২৫টি ঐচ্ছিক বিষয় চিহ্নিত আছে তার ভেতরে নৈর্ব্যাচনিক ১টি ও ঐচ্ছিক ১টি বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমাদের ধারণা যে এত দীর্ঘ তালিকা বাস্তবসম্মত নয়। কোন জাতীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য কোন কোন বিষয় ঐচ্ছিক ও নৈর্ব্যাচনিক হিসেবে ব্যবস্থা করা সম্ভব সেটি বর্তমানে মহাবিদ্যালয়ের শিখন তালিকা থেকেই নির্দিষ্ট হতে পারে। সেখান থেকেই মুক্ত নৈর্ব্যাচনিক বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় থেকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করা দরকার। সেটা হলে সম্ভবত পরবর্তীতে অর্থায়নের বিষয়ের সাথে সহযোগী বিষয়গুলো বিবেচনা করার সুযোগ মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর থাকবে। এখানে স্মরণযোগ্য যে, আমাদের মহাবিদ্যালয়ের প্রবণতা হলো কতগুলো সহজ বিষয়কে শিক্ষার্থীদের ভালো গ্রেড জিপিএ পাবার আশায় প্রলোভিত করা। অন্যদিকে মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সহযোগী ও যোজক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু মহাবিদ্যালয়ের অনুমোদন বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের যথাযথ সুযোগ আছে কি-না, সে বিবেচনায় অনেকসময়ই দেয়া হয় না, রাজনৈতিক চাপের কারণে, সে কারণে মুক্ত নৈর্ব্যাচনিক ও পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব হিসেবে তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজন। দ্বাদশ শ্রেণীর পরে মূল্যায়নের ব্যবস্থায় জিপিএ পদ্ধতির কথা বলা আছে। আমরা জানি গ্রেড পয়েন্ট দিতে গেলে এর একটি গাণিতিক ধারণা থাকতে হয়। এই গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে ফলাফল প্রকাশ একটি বিষয় এবং পরীক্ষকের মূল্যায়ন কিন্তু ভিন্নতর ব্যাপার। গ্রেড পয়েন্টের বিষয়ে যে বিতর্ক আছে সেটি হলো এবস্যুলুট না রেলেটিভ মার্কিং হবে সেটি নিয়ে। মার্কিন মুল্লুকে যেখানে গ্রেড পয়েন্টের এক প্রাধান্য সেখানেও তারা স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে উচ্চতম কত পার্সেন্টাইলের ভেতরে ছাত্রটি ছিল সেই ভিত্তিতে তার মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশে যেহেতু পরীক্ষা একই প্রশ্নের ভিত্তিতে সারা দেশে করার ব্যবস্থা রয়েছে, সেজন্য স্কুলভিত্তিক পার্সেন্টাইল ফলাফল আমরা বিবেচনায় নিতে পারি না। গবেষকদের বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, সার্বিক বাংলাদেশের ফলাফলের ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠানের বিবেচনা স্কুল ও কলেজের উন্নয়নের জন্য কতটুকু সহায়ক হয়। যখন ছাত্রসংখ্যা কম ছিল তখন সারা বাংলা আসামে একই বোর্ডের অধীনে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে পরীক্ষা বোর্ডেরও সংখ্যা বেড়েছে। মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একই প্রশ্ন করার প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয় কিন্তু ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধিতে পরীক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরীক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণে অতীতে যে ব্যবস্থা ছিল সেটা কতটুকু মানা সম্ভব হচ্ছে সে বিষয়ে মূল্যায়ন নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের প্রশ্ন থেকেই যায়।

কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারেও ঐচ্ছিক খাতের পঞ্চাশটি বিষয়ের যে তালিকা সেটিকে গ্রুপভিত্তিক করা হলে ভালো হতো। তাহলে সহযোগী ও যোজক বিষয় চিহ্নিত করা সহজ হতো। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার বিভক্তি লক্ষ্যণীয়। মাদ্রাসা শিক্ষার আবশ্যিক বিষয় সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা থাকতে পারে বলে ধারণা হয়। ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও পেশাগত শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনার দাবিদার। বারো বছর শিক্ষার পর তিন বছরের শিক্ষাদান করে ডিপ্লোমা না দিয়ে বরং আরও এক বছর সংযোজন করে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়। প্রয়োজনে দুই বছর শেষ করে এসোসিয়েট ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা থাকতে পারে। ডিপ্লোমা ও ডিগ্রীধারীদের ভেতরে বর্তমানে যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভাজন এবং ডিপ্লোমাধারীদের অনেকক্ষেত্রে অপাংক্তেয় মনে করার প্রচেষ্টা সেটা দূরীভূত করা প্রয়োজন। এদেশে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন রয়েছে এবং বিদেশে জনশক্তি রপ্তানীর ক্ষেত্রে এ জাতীয় পরিবর্তন সহায়ক হবে বলে আমাদের ধারণা।

শিক্ষক শিক্ষণ: শিক্ষক শিক্ষণ একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এক সময়ে শিক্ষক শিক্ষণের জন্য কয়েকটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পরবর্তীতে বেসরকারি খাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনেক কলেজের আবির্ভাব ঘটে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক। শিক্ষক শিক্ষণের বিষয়টি প্রায়োগিকভাবে দেখা প্রয়োজন। অতীতে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের সাথে একটি করে স্কুল থাকতো যেখানে এই প্রায়োগিক বিবেচনাগুলো তুলে ধরা হতো এবং এই শিক্ষক শিক্ষণের মধ্য দিয়েই পাঠক্রমে ব্যবহৃত বইগুলোরও মান ও ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল। বর্তমানে শিক্ষণ পেডাগজির প্রাধান্যে প্রায়োগিক দিকটি অনেকসময়ই অবহেলিত বা উপেক্ষিত থাকে। শিক্ষক শিক্ষণের মূল্যায়নের সময়ও এটি তেমন গুরুত্ব পায় না। প্রাথমিক শিক্ষায় নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সাথে পাঠদানের প্রায়োগিক বিষয়গুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। আমাদের ধারণা সরকারিভাবে প্রতিটি উপজেলায় ক্রমান্বয়ে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ ও পুনর্শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত এবং প্রতিটি জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সরকারিভাবে এরকম প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এখানে অবশ্যই একটি প্রশ্ন আসবে যে, উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষক শিক্ষণ এ বিষয়ে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত কি-না? বর্তমানে এটার বিস্তারিত কোনো ব্যবস্থা নেই। ধরে নেয়া হয় একটি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করলেই তিনি শিক্ষাদানের উপযুক্ত হয়ে থাকেন। বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষকদের শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত তাহলে তার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিষয়টি সম্ভবত আরো নাজুক।

সেখানে শিক্ষক নির্বাচনে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের দক্ষতা ও গবেষণার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। কারিগরি ও পেশাজীবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নির্বাচনেও যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। এখানে প্রায়োগিক ও পেশাগত জ্ঞান বিষয়টি সম্পর্কে অধীত জ্ঞানের সাথে সমন্বিত না হলে যথাযথ শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়। শিক্ষার মানোন্নয়নে মানসম্মত শিক্ষকই প্রধান চালিকাশক্তি। এসাথে প্রয়োজন শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা অনুসর এবং বিভিন্ন সহযোগী বিষয়ভিত্তিক বিভাগ এ বিষয়ে তৎপর হতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষার বাস্তবতা নিয়ে গবেষণার অপ্রতুল্যতা রয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন স্তরে চলমান বিবর্তন আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার মান সম্পর্কে গবেষণালব্ধ সমস্যা সমাধানকারী গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিবেচনায় না নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও গবেষণা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অথবা দাতা নির্দেশিত প্রক্রিয়া অতীতে অনেক সময়ই কার্যকর ভূমিকা রাখেনি। শিক্ষক শিক্ষণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিকেন্দ্রিভূত হওয়া প্রয়োজন। এসাথে যুক্ত আছে শিক্ষক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে প্রণোদনার বিষয়টি।

উচ্চ শিক্ষা: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানভিন্নতা একটি বিতর্কিত বিষয়। বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব উচ্চ শিক্ষায় একটি ব্যয়বহুল অবস্থান সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শৃঙ্খলার অভাব মানসম্পন্ন শিক্ষাকে সময়সাপেক্ষ এবং অনেকখানি শিক্ষার্থীর স্বীয় উদ্যোগ নির্ভর করে তুলেছে। সরকারের অনেক রাজস্ব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয় করা হয়। ডিগ্রী খাতে দুই, তিন, চার বছরের ব্যবস্থা উপস্থিত। এ বিষয়গুলোর সমাধানের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উচ্চ শিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের প্রস্তাবনা বিবেচনার যোগ্য। স্মরণ করা যেতে পারে যে, শিক্ষার উন্নয়ন বৃত্তে উচ্চ শিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থীরাই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। সে কারণে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দক্ষতা এবং উচ্চমান সম্পন্ন করে তোলা আবশ্যক। এজন্য পাঠাগার, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরী, গবেষণা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান প্রবাহ, ছাত্রর অর্জিত মানের মূল্যায়ন এবং শিক্ষকের শিক্ষাদান সম্পর্কে ছাত্রের মূল্যায়ন প্রয়োজনীয় বলে বিভিন্ন দেশে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনামূলক বিচার অনুপস্থিত। একটি স্বাধীন সংস্থার অথবা উচ্চ শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এই তুলনামূলক মূল্যায়ন কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় কলেজ এবং পেশাজীবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে রাজনৈতিক সংশ্লেষের কারণে মেধা, গবেষণা, প্রকাশনা, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এ সমস্তই অবমূল্যায়িত হয়ে থাকে এবং পদায়ন, পদোন্নতিতে রাজনৈতিক সংশ্লেষ দেখা দেয়। উচ্চ শিক্ষার মান উন্নীত করতে হলে গুণান্বিত শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়াও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের বিষয়টি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত একটি সীমার মধ্যে রাখার প্রয়োজন আছে। সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছাত্র ও শিক্ষকের জ্ঞানকে নতুন নতুনভাবে উপলব্ধি ও বিচার করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যেমনি করে বিজ্ঞান গবেষণাগার। আমাদের বিজ্ঞান গবেষণাগারের দীনতা এবং পাঠাগারের সীমিত সংগ্রহ ও ততোধিক সীমিত ব্যবহার উচ্চ শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলনীয় করে তুলতে সহায়ক হয় নি। এদেশে একটি বিতর্ক অনেকদিন ধরেই চলছে সেটি হলো উচ্চ শিক্ষা কী সকলেই অধিকার? মেধার বিবেচনায় উচ্চ শিক্ষার প্রবেশদ্বার খুলে দেয়া উচিত এবং উচ্চ শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার মত সর্বজনীন অধিকার নয়। বিতর্কের অন্য একটি দিক হলো উচ্চ শিক্ষার অর্থায়ন। অনেকের দাবি যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য বেতন গ্রহণ অথবা বেতন বৃদ্ধি যথার্থ নয়। এক সময় ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেধাবী ছাত্রের বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। এখনো কোনো কোনো দেশে এটি বিদ্যমান আছে। গবেষণায় দেখা যায়, উচ্চ শিক্ষায় সরকারি অর্থায়ন কম হলেও এর ব্যক্তিগত অর্থায়ন কিন্তু ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। সে কারণে অর্থায়নের ব্যাপারে একটি ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি খরচ এবং কিছু উন্নয়ন খরচ বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই ব্যবস্থা না করতে পারলে এর সার্বভৌমত্ব সরকারের হস্তক্ষেপে নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। আইন দিয়ে এই হস্তক্ষেপ অনেকসময়ই সীমিত করা যায় না। সে কারণেও শিক্ষার্থীর বেতন ও অন্যান্য ব্যয় যেমনি সময়ের সাথে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়কেও ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ও কর্মের নানা সুযোগ সৃষ্টি একটি অপরিহার্য বিষয়। সরকারের উচিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এনডাউমেন্ট সৃষ্টিতে কর সুবিধার ব্যবস্থা করা। এ বিষয়টি আমাদের শিক্ষা কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

ভালো মেধাবী ছাত্রদরদী শিক্ষক পেতে হলে অবশ্যই তাদের চাকুরির শর্ত ও সামাজিক মর্যাদা এমন পর্যায়ের হওয়া প্রয়োজন যেটি এদেশের কৃতি ছাত্রদের শিক্ষালয়ে কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করবে। দাবি করে মর্যাদা লাভ করা যায় না। কর্মের মাঝেই শিক্ষক মর্যাদা লাভ করেন, এ কথাটাও শিক্ষকদের মনে রাখা প্রয়োজন। তবে জীবনমানের বিষয়টির দিকে দৃষ্টি না দিলে বর্তমানে শিক্ষকেরা যেভাবে নানাবিধ কর্মে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছেন এবং যার ফলে শিক্ষাদান বিঘ্নিত হচ্ছে, সেই সমস্যা থেকে উত্তরণ খুব সহজ হবে না। শিক্ষা কমিটি আগামী দিনের বিবেচনায় কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে তাদের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছেন। আমরা শিক্ষার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই গত চল্লিশ বছরে বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, যেগুলো পরামর্শক এবং আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই রিপোর্ট অনেকগুলো বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত অভিমত তুলে ধরেছেন এবং আমরা যে পাঁচটি কমিটি/কমিশনের রিপোর্ট এর সাথে বিবেচনা করেছি তাতে অনেকগুলো বিষয়ে ঐক্যমত্য পরিদৃষ্ট হয়েছে। যেহেতু ১৯৭৪ থেকে ২০০৯ এই মতামতগুলি নানা সময়ে নানাভাবে উত্থাপিত হয়েছে, সেহেতু ঐক্যমত্যের অবস্থান থেকেই আমাদের এই রিপোর্টটি বিবেচিত হওয়া উচিত। তিন ধারার শিক্ষাকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা এই প্রথম নয়। কিন্তু এবারই প্রথম একটি বিস্তৃত প্রস্তাবনা এ বিষয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। তবুও অনেক বিষয়ে হয়তো বিবেচিত হয় নি। বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে সমস্যাগুলো বিবেচনার দাবি রাখবে সে বিষয়গুলো আমাদের সহমতের মাধ্যমে বিবেচনা ও সিদ্ধান্তে দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে। একবিংশ শতকের যে স্ফূরিত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হবে না।

সহযোগিতায়: বিধান চন্দ্র পাল ও সানজিদা হক বিপাশা